International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
ISJN: A4372-3144 (Online) ISJN: A4372-3145 (Print)
Volume-III, Issue-VII, August 2017, Page No. 13-22
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

ছোটগল্পকার হরিশংকর জলদাস ও 'জলদাসীর গল্প'

ড. সুশান্ত ঘোষ
অধ্যাপক, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারতবর্ষ

Abstract

Harishankar Jaladas not only a popular lovelist, he also a great short story writer of Modern Bangadeshi Bengali literature. He belongs to a subaltern community in Bangladesh. He wrote his literature for the subaltern community of Patenga in Bangladesh. He composed many novel. His very famous literary work 'Jaldashir Galpa' actually a parallo study of Jaladash. Jaladashi means are Kaivartya women in patenga. They are very poor very uneducated but they are very much sacrifice in his daily work. 'Jaladashir Galpa' a real deed of Subalturn Women. Here have ten short stories. Each story explained with Jaladashi & his socio economic status. We analysis the 'Jaladashir Galpa' in this eassy.

চট্টগ্রামের পতেঙ্গাবাসী 'জলপুত্র' ডঃ হরিশংকর জলদাস উত্তর আধুনিক কালের বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যের একজন ব্যাতিক্রমী ঔপন্যাসিক কেবল নন; ছোটগল্পকার হিসাবেও তিনি এক ব্যতিক্রমী প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাস রচনার প্রতি তাঁর সমধিক আগ্রহ থাকলেও ছোটগল্প রচনাতেও তিনি অকৃপন। তাঁর রচিত গল্পের সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য এবং প্রসঙ্গ, রচনারীতি, ভাষাপ্রয়োগ, শৈলীনির্মান সমস্ত দিক থেকেই তাঁর গল্পগুলি নতুনত্ব ও অসাধারনত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলা ছোটগল্পের দারুন বিবর্তন ঘটেছিল, বাংলাদেশী বাংলা সাহিত্যেও ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। নিম্নবর্গীয় ও প্রান্তীয় ব্রাত্য সমাজের অবহেলিত মানব সম্প্রদায় এবং আর্থসামাজিক তথা রাষ্ট্রিক পরিমণ্ডলে তাদের জীবন ও জীবিকার দ্বান্দ্বিক রূপরেখাগুলি বাংলা ছোটগল্পে অভিন্ন রীতি পদ্ধিতি হিসাবেই সমগ্র বিশ্ববাংলা সাহিত্যে উঠে এসেছে। কেননা দেশভাগ, স্বাধীনতা সমাজের প্রত্যন্ত নিম্নবর্গীয় জনজাতিকে কোনও পরিবর্তনের দিশা দেখাতে পারেনি। জাতিগত সাম্প্রদায়িকতা, নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা এগুলো অবিকৃতভাবেই বয়ে গেলো সমাজে। হরিশংকর জলদাস সমাজকথিত অতি নিম্নবর্ণের মানুষ। সারা জীবন তাকে সেই যন্ত্রনা বয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। প্রতিপক্ষকে জাত্যাভিমানের জবাব দেবার জন্য গবেষনা পর্যন্ত করেছেন কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা তথা নৃতাত্ত্বিক উৎসের খোঁজে। সেই কারণে তার প্রায় সমস্ত সাহিত্য নিম্নবর্গীয় প্রান্তবাসী কৈবর্ত্য জলদাস জলদাসীদের নিয়ে রচিত হয়েছে। 'জলপুত্র' 'মোহনা' 'একলব্য' 'কমবি' প্রভৃতি কালজয়ী উপন্যাস তার নিজ সমাজের নিম্নবর্নীয় মানুষ ও সমাজের ঐতিহাসিক ও সামাজিক দলিল। হিসাবে গণ্য হতে পারে। 'জেলের পউলা' হরিশংকর উপন্যাসের মতোই ছোটগল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর চিরপরিচিত কৈবর্ত্য সমাজের অতি সাধারণ ঘটনা ও চরিত্রকে এনে। তাঁর 'জলদাসীর গল্প' গ্রন্থটির দ'শটি গল্পেই তিনি প্রান্তীয় জেলে সমাজের রমনীর প্রসঙ্গ অনিবার্য ভাবেই এনেছেন

কেননা কৌমসমাজের মতো চট্টগ্রামের পতেঙ্গাবাসী কৈবর্ত্য সম্প্রদায় সমবায়ী। পুরুষনারী একই কার্মে লিপ্ত থাকে। একে অন্যের পরিপূরক হয়ে এই কর্তব্যপটু অতীব সাংসারিক জলদাসীদের অনালোকিত অনেক দিক রয়েছে। হরিশংকরের গল্পে জলদাস ও জলদাসীদের চেতন কিংবা অবচেতনে লুকিয়ে থাকা অচেনা কাহিনী মূর্ত হয়েছে অত্যন্ত বাস্তব সমৃদ্ধ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে। তার গল্পগুলি অঞ্চলিকতার রঙে বর্নময় এবং চিত্রায়নে জীবন্ত। গ্রন্থটি প্রকাসশকালে সম্পাদক যথার্থই লিখেছেন- "হরিশংকর জলদাস সমুদ্রপাড়ের জেলেদের নিয়ে লিখেছেন 'জলপুত্র' ও 'দহনকাল' নামের উপন্যাস। এবার লিখলেন 'জলদাসীর গল্প', জেলেনারীদের নিয়ে হরিশংকরের প্রথম গল্পগ্রন্থ এটি। জেলে দাম্পত্যজীবন সমবায়ী। এ জীবনে নারী-পুরুষের সমান অবদান। কিন্তু অন্যান্য সমাজের মতো জেলেনারীরাও বঞ্চিত অবহেলিত। তাদের মর্মন্তুদ হাহাকার, বিপর্যয়-বিপন্নতার বেদনার্দীন গৃহকোনে গুমরে মরে। হরিশংকর গ্রন্থস্থ দশটি গল্পে এই জেলেনীদের জীবনকথা শুনিয়েছেন।"[১] সেইকারনেই নামকরন করেছেন 'জলদাসীর গল্প'।

তাঁর 'কোটনা' ছোটগল্পটি পরিণত হাতের রচনা না হলেও অসাধারন এক নতুনত্বের দাবিদার। নিজের মায়ের বেশ্যাবৃত্তি ও পরকীয়া যৌনাবাস এই গল্পের মূল বক্তব্য। জেলে নারিরা পরকীয়া প্রেমে ও পরকীয়া মিলনে তৎপর থাকে এই বিষয়টিকেই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। সেই কথাটি বলার স্থান হয়েছে গল্পের একেবারে শেষে মাত্র দুটি লাইনে দুই শৈশব ও কৈশোর বন্ধুর পুর্নমিলনের সময় কথোপকথনে। আমাদের দেশে নবজাগরন ঘটলেও সাম্প্রদায়িকতা ও নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতি ঘৃনাপোষন করা কখনো দূরীভূত করা সম্ভব হয়নি। দেশভাগের পর স্বাধীন বাংলাদেশে ও উচ্চশ্রেনীর হিন্দু মুসলমানদের কাছে নিম্নবর্গীয় কৈবর্ত্যসমাজ ছিল ঘৃণা ও উপেক্ষার পাত্র। গল্পটিতে বর্ণবৈষম্য এবং নিম্নশ্রেনীর শিক্ষা লাভের অপ্রতুনতার কথা গল্পকার দীর্ঘভাবে বর্ননা করেছেন। মুচির ছেলে অশোক ঋষি দাস ওরফে আশোকদাস ওরফে আশোক চৌধুরী আশৈগব বন্ধু ও সহপাঠী ক্ষীরমোহন জলদাস একইস্কুলে ভর্তি হয় প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য। স্কুলে ভর্তি হবার সময় অশোক অনুভব করে তারা নিম্নবর্ণের মানুষ এবং তাদের প্রতি উচ্চবর্ণের মানুষেরা ঘৃনা পোষন করে। আশোককে ভর্তির সময় তার বাবাকে হেডমাস্টার অপমান করে মুচি বলে। -"মুচির ছেলে পড়বে জুতোসেলাই করবে কে?" স্কুলের শিক্ষক মৌলভী সাহেবের অনুরোধে স্কুলে ভর্তি হলেও প্রধান শিক্ষক ভবতোষ চক্রবর্তীর কড়া নির্দেশ ছিল – "ক্লাসের একেবারে শেষ বেঞ্চে বসবি তুই; খবরদার সামনের বেঞ্চিতে বসার চেষ্টা করবি না।" বর্ণবৈষম্যের শিকার অশোক আর ক্ষীরমোহনের বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ক্ষীর মোহন পড়াশোনায় অশোকের চেয়েও ভালো। 'দুর্দান্ত' 'ভয়ঙ্কর' রেসাল করে সে। এহেন ক্ষীরমোহন একদিন সবকিছু ত্যাগ করে কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। 'জলপুত্র' শ্যামচাঁদ পুত্রশোকে মারা যায়। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হবার পর ক্ষীরমোহনের সাথে পুর্ণমিলন ঘটে অশোকের। ইতিমধ্যে আশোক মুচি মাধ্যমিক পরীক্ষার এডমিট কার্ডে নিজের পদবী পরিবর্তন করে চৌধুরী লেখে এবং কায়স্থ মেয়েকে বিবাহ করে মুচি থেকে কায়স্থ হয়ে যায় সমাজের চোখে সে এখন উচ্চবর্ণ কেউ তাকে অপমান বা অসম্মান করে না। ক্ষীরমোহন নিজের জাত সম্প্রদায়ের জন্যে গর্ব করত এবং প্রধান শিক্ষক তাকেও অশোকের ন্যায় উচ্চশ্রেণীর পদবী যোগ করার পরামর্শ দিলে সে ঘৃণা ভরে তা ত্যাগ করে। এহেন মেধবী, গর্বিত যুবক যখন হারিয়ে যায় তখন তার পিছনে তাকে কোন না কোনও কঠিন সত্য। সেই সত্যটি যখন জানতে চায় তখন ক্ষীরমোহন জলদাস জানায় সত্য কথাটি– "আমি ঢাকায় চলে গিয়েছিলাম সেদিন। তারপর মানুষকে জিজ্ঞেস করে করে নারায়নগঞ্জের টানবাজারে। হ্যাঁ, বেশ্যাপাড়ায় গিয়ে বেশ্যার দালালি করেছি এতদিন।' তার এই অনাকাঙ্খিত পরিবর্তনের কারনটি খুব বেদনাদায়ক অথচ নির্মম সত্য। - "তোমার মনে আছে কিনা জানি না। যেদিন হেডস্যার তোমার পদবী নিয়ে রঙ্গ তামাসা করলেন, সেদিন একটু আগেভাগেই স্কুল ছুটি হয়ে গিয়েছিল। পাড়ার কাছাকাছি পৌঁছে তুমি বলে গেলে তোমার বাড়ির দিকে। আমি পা বাড়ালাম আমার ঘরের দিকে। মা তো ঘরে আছে। এদিকে ওদিকে তাকালাম। মাকে দেখলাম না। ঘরে বাঁশের দরজাটা আধো খোলা। আমি আনমনে ঘরে ঢুকে গেলাম।' ...তাকিয়ে দেখলাম ঘরের ভেতর মা বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। কাকা তার বুকের উপর।" বিবাহে অনিচ্ছুক কাকার সঙ্গে বাবাকে ফাঁকি দিয়ে অবৈধ শারীরিক মিলনে

প্রবৃত্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে ক্ষীরমোহনের কাছে বেশ্যাবৃত্তি বলে মনে হয়েছে। নিম্নবর্গীয় জলদাসীদের মধ্যে এটা যে স্বাভাবিক একটা বিষয় মানতে পারেনি গর্বিত ও 'ভয়ঙ্ক'র' মেধাবী ক্লাসে 'থার্ড' হওয়া ক্ষীরমোহন। তাই নারায়নগঞ্জের বেশ্যাপাড়ায় গিয়ে বেশ্যার দালাল থাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'কোটনা' বলে সেই পেশা গ্রহন করেছে। কেননা তার মনে মায়ের প্রতি যে তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার জাগ্রত হয়েছিল তাতে নিজকে 'বেশ্যাপুত্র' বলেই মেনে নিয়েছিল। -"বেশ্যার পোলার কোটনা হওয়াই তো স্বাভাবিক এই ধারনায় যে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছে।

গল্পটি ছোটগল্পের "শেষ হইয়াও হইল না শেষ' এই অতৃপ্তির লক্ষনাক্রান্ত। ভাষা ব্যবহারেও জলদাস স্বাভাবিকতার মাত্রা বজায় রেখেছে। অসীম সাহসিকতার সঙ্গে মায়ের এহেন অশিষ্ট চরিত্র এঁকে দেখিয়েছেন কৈবর্ত্য সমাজের স্তরে স্তরে জমে থাকা পচা পাকের দুর্গন্ধকে। নিম্নবর্নীয় জলদাসীদের যৌনকাম এখানে যথাযথ ভাবে চিত্রিত।

হরিশংকর জলদাসের 'দইজ্যা' গল্পটি একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। হরিশংকরের স্বদেশপ্রীতি ও প্রতিবাদীকণ্ঠ 'দইজ্যা বুইজ্যা'র মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের অমানুষিক নির্মম অত্যাচারের ভয়াবহ চিত্র এইগল্পের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সমাজজ্ঞ ও বাস্তববাদী হরিশংকর জলদাস অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন 'দিহ্যা বুইজ্যা' গল্পের মাধ্যমে এই বিষয়টি। পাকিস্থানী মিলিটারী ক্যাপ্টেন মুর্শিদ এবং স্থানীয় মোসাহেব রাজাকার বাহিনী কৈবর্ত্যকিশোরী পারুলকে ধর্ষণ করে। সমাজের নিম্নবর্গীয় পারুলের পরিবারের করুন অসহায়তা ফুটে ওঠে। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে নারীধর্ষণ একটি সাধারণ ও অতিনগন্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুর্শিদ ও রাজাকার মোজেদ বাহিনী এই কাজ চালাত পতেঙ্গার কৈবর্ত্যপাড়ায়। রাতের অন্ধকারে জোর করে গণধর্ষণ করা হত যুবতী কিশোর থেকে বৃদ্ধা সকলকেই। ক্যাপ্টেন মুর্শিদ বেশ কিছুদিন দেশে ছেড়ে পূর্বপাকিস্থানে দায়িত্ব পালন করেছে। তার সঙ্গী হয়েছে মজিদ রাজাকার। একদিন স্ত্রীর চিঠি পায় মুর্শিদ। তার স্ত্রীর মুখটা ভেসে উঠতেই তার মধ্যে জেগে ওঠে এক অতৃপ্ত যৌনাকাঙ্খা। সে সেই কথা জানায় বাজাকার মজিদ ও তার বাহিনীকে। তারাই ক্যাপ্টেনকে পারুলের বাড়ি নিয়ে গিয়ে পারুলকে গণধর্ষণ করে তার বাড়ির সকলের সামনে। -"বৌয়ের চিঠি ক্যাপ্টেন মোর্শেদের শরীরে কাম জাগায়। হায়না তার ভিতরে সারারাত আকুলিবিকুলি করে। সকালে একফাঁকে মোর্শেদ রাজাকার মজিদকে ডেকে পাঠায়। আকারে ইঙ্গিতে তার শরীরে চনমন করার কথা বলে। বলে 'অব ম্যায় ক্যায়া ক্রুঙ্গা।'

মজিদ বলে হাম বুঝ গয়া ছার। কোই চিন্তা নেহি হে। সব মিল যায়গা।' আর এরই পরিণতি কিশোরী পারুলকে নির্মমভাবে ধর্ষণ। পারুলকে যখন ধর্ষণ করে গ্রামের কোন লোকেই তার প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অসমর্থ হয়। প্রাণভয়ে সকলেই দূরে থাকে একমাত্র 'দইজ্যা বুইজ্যা' এর প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়বার যখন মোর্শেদ ও রাজাকার বাহিনী পারুলকে পুনবার ধর্ষণ করতে উদ্যোগী হয় তখন 'দইজ্যা বুইজ্যা' ধারালো কাটারি দিয়ে মোর্শেদ ও রাজাকারকে খুন করে শহীদ হন। আপাত পাগল ও অবৈবয়িক দইজ্যা বুইজ্যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে এক প্রকৃত প্রতিবাদীর এক নিরাসক্ত ও নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমিকের। জলদাস 'দইজ্যা বুইজ্যার' চরিত্রটি এক অসীম মহনীয় উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। সবাই যখন আত্মরক্ষার্থে ব্যস্ত সেই একমাত্র অত্মবলিদান দিয়ে কৈবর্ত্য নারীর সম্মানরক্ষায় এগিয়ে এসেছে এবং শহীদ হয়েছে। মুখ্যতঃ 'দইজ্যা বুইজ্যার' প্রতিবাদ রূপটি এখানে দেখানো হলেও পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনীও ইতিহাস ও বাস্তবতার সঙ্গে মেলবন্ধন করে প্রকাশ করেছেন। হিন্দু কিনা তা পরীক্ষার জন্য নগ্ন করা কিংবা মেয়েদের কালিঝুলি মাখিয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে রাখার চিত্র একান্তই বাস্তব এরই ফাঁকে জলদাস কৌশলে 'জলপুত্র'দের জাতিগত পরিচয়টি দিতে গিয়ে সমস্ত উচ্চসমাজে থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র করেছেন। কেননা উচ্চশ্রেনীর হিন্দু বা মুসলমান সবার কাছেই তারা ব্রাত্য ও নিন্দিত। তাই গল্পে বলতে শোনা যায়।- "ফিরে যাবার আগে ক্যাপ্টেন জড়োকরা জলদাসদের জিজ্ঞাসা করে, - তোম লোগ হিন্দু হো'।

জলদাসেরা চুপ করে থাকে।
'বলো তোম হিন্দু হো কি নেহি।' গর্জন করে ওঠে ক্যাপ্টেন।
রাজাকার মজিদ উচ্চস্বরে বলে ওঠে, 'ওরা হিন্দু হ্যায় ছার। -মালাউন, ডোম ছার।'
দইজ্যা বুইজ্যার সেদিনের মাথা পরিস্কার। ভিড়ের মধ্য থেকে সে হঠাৎ বলে ওঠে 'না না ছার, হামরা লোক হিন্দু না। জাইল্যাছার, জাইল্যা আমোরা।'

তখন বোঝা যায় কেবল আত্মরক্ষার জন্য যে একথা বলেছে এমন নয়। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও তাদের হিন্দু বলে মান্য করত না। তার জন্য জামে থাকা ক্ষোভ প্রতিবাদ উচ্চকিত হয়েছে এখানে। হরিশংকর জলদাস যে বর্নাশ্রমের প্রতিবাদ করেছে তার প্রতিটি গল্প উপন্যাসে দইজ্যা বুইজ্যা' তারই একটি অংশ। 'দইজ্যা বুইজ্যা' এখানে নায়ক। জলদাসী ও জলপুত্রদের অসহায় বিমর্ষ অবস্থার মাঝে তার প্রতিবাদীমনস্কতা তাকে স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

হরিশংকর জলদাসের রক্তের মধ্যে বর্ণাশ্রমের প্রতি চিরদিনই একটি অতিপ্রকট ও শক্ত প্রতিবাদ ছিল। শৈশব থেকে অধ্যাপনা জীবন সবর্ত্রই তিনি উচ্চবর্ণের দ্বারা লাঞ্চিত হয়েছিলেন এবং সেই অপমান এর প্রতিবাদী কণ্ঠে জবাব দিতেই সাহিত্যের আসরে তিনি আবির্ভূত হন। উচ্চব্রাহ্মন শ্রেনীর মানুষদের অবাস্তব জাতিবিদ্বেষ এবং তার অসাড়তার মনোগ্রাহী গল্প 'সুবিমলবাবু।' মিথ্যা জাত্যাভিমানী ব্রাহ্মন সুবিমল বাবুও কামভাবে জেলেনীর মেয়েকে শয্যাসঙ্গে করে যৌন ক্ষুধা চরিতার্থ করার কাহিনী বাস্তবতার সঙ্গে রচিত হয়েছে সুবিমলবাবুর চরিত্রে। উচ্চশ্রেনীর ব্রাহ্মন্দের চিরঘৃনা বর্ষায় নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ মানুষদের প্রতি। নিজের জাত ধর্ম বাঁচাতে গিয়ে 'জাতের নামে বজ্জাতি করে।' সুবিমলবাবু ও তার পরিবার নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারঙ্গন সুবিমলাবাবুর পিতা কন্যা পুত্রের বিবাহে জ্যোতিষবিচারকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন তাই নিঃখুত পাত্র না পাবার কারনে দু'ই প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহও দিতে পারেনি। পরিনামে সুবিমলবাবুও বিয়ে করা আর সম্ভব হয়নি। অন্যের স্পর্শ করা খাবার পর্যন্ত মুখে তোলেন না সুবিমল বাবু। এহেন সুবিমলবাবু একদা অসুস্থ হয়। তাকে পরিচর্চার জন্য তারই সহকর্মী একটি বিধবা সন্তানহীন জেলেনি কে এনে দেয়। অসুস্থ থাকার জন্য প্রায় বাধ্য হয়েই তাকে কাজে নেয়। এই জেলেনির দেহ দেখে একদিন সুবিমলবাবুও যৌন কামনায় উগ্র হয়ে ওঠে। ঘরের দরজার 'হুড়কো' টা-দিয়ে জোর করে মিলিত হয় জেলেনির সঙ্গে। জাত্যাভিমান সুবিমলবাবু জেলেনির সঙ্গে সহবাস করে তৃপ্ত হয়। জাতের অহংকার মুহূর্তে ধ্বসে পড়ে জেলেনির শরীরের আনন্দে- "সেদিন শুক্রবার। কলেজ সাপ্তাহিক ছূটি। শিবচর্তুদশী উপলক্ষে শনিবারও কলেজ বন্ধ। বহুদিন পর নুরুল ইসলাম সাহেব বাড়ি গেছেন। ...দরজার পাশে বারান্দায় মাছ কুটছে মালতি। বিছানা থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে। মাছ কুটতে কুটতে বুকের আঁচলটা সরে গেছে মালতীর। টুটাফাটা ব্লাউজ। ভেদ করে ডানপাশের পুষ্ট স্তনটি বেরিয়ে আসতে চাইছে তার। বাম পাশের মালতীর বাঁ হাঁটুতে চাপা পড়ে আছে। সুবিমলবাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন। ...

মাছ কুতা সেরে মালতি দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে ঘর মুছছে। কখনো সামনে ফিরে কখনো পিছনে ফিরে ঘরে মুছে যাচ্ছে মালতি সুবিমলবাবু স্নান করতে যাবেন করেও গেলেন না। একধরনের অব্যক্ত আলস্য তাকে ঘিরে ধরল। তিনি বসা অবস্থা বিছানায় শুয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে মালতির ঘরমোছা নিবিড় চোখে দেখতে লাগলেন। মালতি পিছন ফিরে ঘর মুছছে। তার পাছা কখনো ডাইনে বাঁকাচ্ছে কখনো বাঁয়ে, কখনো ওপরে উঠছে, কখনো মেঝের একেবারে কাছাকাছি। হঠাৎ করে মাতাল হাওয়া লাগলো সুবিমলের মনে শরীরতা মোড়ে দিয়ে উঠল তাঁর। ভেতরটা এলোমেলো ভাবে বাঙতে শুরু করল তাঁর। নাক দিয়ে গরম হাওয়া বেরোতে লাগল। ধীরে ধীরে বিছনা থেকে নামলেন তিনি। দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভিতরে থেকে হুড়কো তুলে দিলেন দরজার।

ঘরের ভিতর থেকে মালতীর কণ্ঠ ভেসে এল- করেন কি, করেন কি ছার?
তারপর চুপচাপ।
কিছুক্ষণ পরে আবার মালতীর কণ্ঠ, আপনি শুদ্ধ ব্রাহ্মন ছার আমি সামান্য জলদাসী।'

তারপর খাটের শুধু কোঁৎ কোৎ শব্দ।

এভাবেই হরিশংকর জলদাস আদিম জৈবিক চাহিদার বিজয়বানী ঘোষনা করেছেন। মৈথুন জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম, নারীপুরুষের মিলন অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কিন্তু জাতের দোহাই দিয়ে তাকে লুকিয়ে রাখা সম্ভবপর নয়। মিথ্যা জাতের বড়াইকরা মুখোশধারী উচ্চশ্রেনী আসল চেহারাটা হরিশংকর বাইরে টেনে বের করেছে। সুবিমলবাবুর চরিত্র এতে লঘু হয়নি বরং স্বাভাবিকতাকে স্থান দেওয়া একজন যর্থাথ রক্তে মাংসে গড়া মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছে এখানে উচ্চশ্রেণীর নারীলোলুপতা নয়, অবচেতনে লুকিয়ে থাকা অবদমিত কামনায় বিস্ফোরন ও তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তার শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে এধরনের চরিত্র অনেক আছে। সুবিমলবাবু একটি টাইপ চরিত্র। আর সংকট মানুষের মতোই তার ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিদ্রার পাশাপাশি যৌনকাম থাকা খুবই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিকতাকেই এখানে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। এবং জাতের অহংকার আর মিথ্যা অভিমান ত্যাগ করা যে জীবনে আনন্দের বসন্ত আসতে পারে এ গল্পে সে কথাই বলতে চেয়েছেন জলদাস। তাই কৌকিলের গান দিয়েই গল্প শেষ করে সুবিমল বাবুর জীবনে বসন্তের আনন্দঘঝ আগমন বার্তার শুভ সূচনা করেছেন- "বাইরে তখন শুধুই খাঁ খাঁ, নির্জনতা। দূর শিমূল গাছ থেকে কোকিলের আওয়াজ ভেসে আমাকে- কু-উ-উ, কু-উ-উ।' অত্যন্ত সরলধর্মী এই ছোটগল্পে ভাষা প্রয়োগ, রচনারীতি ভীষনভাবে নতুনত্বের দাবী রাখে। গল্পের একেবারে শেষে গল্প সমাপ্ত হবার পরও অতৃপ্ত ব্যঞ্জনা রেখে গেছেন গল্পকার। মান্যচলিতের পাশাপাশি, চাটিগ্রাম কথ্য ভাষার প্রয়োগ করে ছোটগল্পটিকে অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে তুলেছেন 'দুখিনী' গল্পের মধ্যে কৈবর্ত্য সমাজের নিদারুন এক বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন। গল্পটির বক্তব্য সামান্য আগোছালো হলেও গল্পটি একটি সার্থক ছোটগল্প। কৈবর্ত্য সমাজের ছেলেরা মাছ ধরতে গিয়ে অনেকসময় ফিরে আসে না। প্রাকৃতির দুর্যোগের শিকার হয়ে মৃত্যুবরন করে। দুখিনী গল্পে 'দুখিনী' শব্দটি বহুমাত্রিক প্রয়োগে ঋদ্ধ। দঃখিনী মনমোহনের মা, দুঃখিনী তার নব্যবিবাহিতা স্ত্রী অনন্তবালা। সকল 'জেলেনি' রাই দুঃখিনী। কেউ স্বামী পরিত্যক্তা হয়ে কেউ স্বামীকে অকালে হারিয়ে কেউ বা পুত্রশোকে দুখিনী। এই গল্পে অভাবের তাড়নায় অভুক্ত অর্বভুক্ত বোলে রমনীর জীবনের দুর্বিপাক ও অসহ্য অসহায়তার রূপটিই মুখ্য হয়েছে। গল্পকার 'contrast' বা বৈপ্যরীত্য তৈরী করেছে এই গল্পে। মনমোহন আর কালাবাঁশি দুই বন্ধু। মনমোহনের বাবা তাদের ত্যাগ করে পুর্নবিবাহ করেছে। মা অনন্তবালা তাদের মানুষ করেছে ভিক্ষাবৃত্তি করে। অন্যদিকে কালাবাঁশির মা নেই বাবা বৃদ্ধ এবং কালাবাঁশির বিবাহ নিয়ে উদাসীন। মনমোহন বিবাহিত, কাঁলাবাঁশির বিবাহ হয়নি। কালাবাঁশি সাঁতার জানে না মনমোহন সাঁতার না জানেও প্রানরক্ষা করতে সক্ষম হয় মনমোহ্ন সাঁতার জেনেও অকালে প্রানবিয়োগ করে। এভাবে একাধিক তৈরী করা হয়েছে গল্পটির মধ্যে। গল্পের শেষের অংশটুকুই এ গল্পের ব্যঞ্জনা দেয় এবং ছোটগল্পের অতৃপ্তভাবটি প্রকাশ করে। মনমোহনের বাবা অভাবের তাড়নায় ভিন্ন গ্রামে কাজ করতে গিয়ে সেখানেই পুনরায়বিবাহ করে সংসারী হয় পূর্বতন পরিবারকে ভুলে যায়। মনমোহন তার আরেক অন্ধভ্রাতাকে নিয়ে মা অনন্তবালা কোনক্রমে বেঁচে থাকে। পরবর্তীতে মনমোহনকে বিবাহ দেয়। কিন্তু মনমোহনই অকালে মারা যায় সমুদ্রের জলে। আর কাকতালীয়ভাবে তার মৃতদেহটিতারই পিতার জালে উঠে আসে। পরিত্যক্ত পুত্রকে চিনতে পারে তার বাবা। কিষ্টপদ ভালো করে চেয়ে দেখে – মৃতদেহটির চিবুকে মস্ত বড় একটা তিল।' এই ইঙ্গিতময়তার মধ্যেই গল্পটি ব্যঞ্জনাসৃষ্টি করে ও একটি সহসাই শেষ হয়ে যায় আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে না। একটি অতৃপ্তিরভাব জাগরূক থাকে কিষ্টাপদ' নিজের সন্তানের মৃতদেহ দেখে কি করেছিল তা আর কোনও উল্লেখ এখানে নেই। অনেকগুলি প্রশ্ন পাঠকের কাছে রেখে সহসাই গল্পটি শেষ হয়ে যায়। গল্পটির বুনোট অত্যন্ত দুর্বল। কাহিনীও তেমন কোন উচ্চতার নয়। কেবল বর্ননা ও পরিবেশন গুন অনন্য সাধারন। প্রশিক্ষিত বাগ্মীর ন্যায় ভাষার সরলতা ও উজ্জ্বল গল্পটির সম্পদ। তবে প্রসবের মধ্যেও গল্পের উদ্দেশ্য জেলেনিদের সাতলামামি বর্ননা সেটি বেশ সুন্দরভাবে পরিবেশিত। মনমোহনের মা, মনমোহনের বউ, কিষ্টপদের বউ, যে পরিবারেই জেলেনিরা পরিচিত হোক না কেন, তাদের দুঃখ বেদনার রোজ নামচাই এখানে প্রকাশিত হয়েছে। কেবল কিষ্টপদের প্রাক্তন স্ত্রী কিংবা মনমোহনের মা দুঃখি নয়, মনমোহনের নব্যবিবাহিতা স্ত্রীও তো দুঃখী, বস্তুতঃ প্রত্যেক জলদাসীই আজন্ম দুঃখী।

এখানে সে কথাইবলা হয়েছে। মনমোহনের মা, কিংবা স্ত্রী এখানে উপলক্ষ্য মাত্র জলদাসীদের প্রকৃত ভাগ্য নির্ধারক আসলে পতেঙ্গার বঙ্গোপসাগরের উত্তাল লবনাক্ত জলস্রোত। এই দিক থেকে দেখলে গল্পটি যথার্থ হয়ে ওঠে। অন্যসকল গল্পের মতোই হরিশংকর এখানেও চট্টগ্রামের আঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার করেছেন এবং স্থানিক রঙকে যথার্থতার সাথে বিকশিত করে তুলেছে।

'টেন্ডেরি ' হরিশংকরের পরিনত প্রতিভার সার্থক প্রকাশ। এই গল্পে গল্পাকার সকল দিক থেকেই সিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন "টেন্ডারি'তে লেখক জেলে দাম্পত্যজীবনের আঁধার দিক টিকে তুলে ধরেছেন। বাস্তব দৃষ্টিতে গল্পটির ভাষা অত্যন্ত অশ্লীল বলে মনে হবে। কিন্তু যদি জেলে সমাজের দাম্পত্যজীবনের প্রাত্যহিক বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায় তাহলে এই অশ্লীলভাষা গুলি বাস্তব ও নিরাসক্ত দ্রষ্ট্রার যথার্থ পরিবয় দেয়। গল্পটি চূড়ান্ত ভাবে মনস্তাত্ত্বিক। স্বামী স্ত্রীর পরকীইয়া প্রেম নিয়ে উত্তপ্ত কথোপকথন খুবই আনন্দদায়ক ও উপযোগী হয়েছে এই গল্পে। পরনারীর সঙ্গে বহদ্দার রাইগোয়াল জলদাসের 'পরকীয়া তার স্ত্রী লক্ষীবালাও জানে। কিন্তু রাইগোয়াল তার স্ত্রীকেই পরকীয়া দোষে দুষ্ট বলে গালি দেয়, লক্ষীবালাও তার উপযুক্ত জবাব দেয়। লক্ষীবালার অখন্ড যুক্তি যখন খন্ডন করতে পারে না তখন দুটি জালের মালিক বহদ্দারের গর্বে উন্নতবুক রাইগোয়াল স্ত্রীকে তার সম্মান রক্ষা করতে বলে কেননা বহদ্দারের 'ইজ্জত' বলে গেলে জেলে বলে জেলেনীরা হাসাহাসি করবে। "নো চিল্লাইও। চিল্লাইলে বগলের গন্ধ পাড়াপশ্যি টের পাইবো। বহদ্দার নাম বঙ্গ-সাগরত ডুবিবো"। নিজের বিবাহিত স্ত্রীকে ফেলে রসবালার সঙ্গে লিপ্ত হয় অবৈধ্য প্রনয়ে। রাতের অন্ধকারে লক্ষীবালাকে ফাঁকি দিয়ে বহদ্দার রাইগোপাল প্রত্যহ রসবালার সাথে মিলিত হয়। লক্ষীবালা তার স্বামিকে ভালোবাসা, যৌবন, ঘৃনা, ঝগড়া সব দিয়েও ফিরিয়ে আনতে অসমর্থ হয়। হরিদাসীর মা এসেও লক্ষীবালাকে তার স্বামীর কুকীর্তির কথা বলে। তুমুলবাদবিসম্বাদ চলে। কিন্তু কোন ভাবেই তার স্বামীকে ফেরানো সম্ভব হয়না। এভাবে থাকতে থাকতে অপমানে ন্যুব্জদেহী লক্ষীর মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা বৃধি পায়। জেগে ওঠে অপমানের বদলা নেবাব। তাই গ্রামের সর্দার বাড়ি গিয়ে সে সব কথা খুলে বলে সর্দার রসবালা আর বাইগোয়ালকে হাতে নাতে ধরে। বিধান দেওয়া হয় 'টেন্ডারি' করার। যখন 'টেন্ডারি' করে লক্ষীবালার বাড়িতে আনাহল যুগলকে তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে ছেলেকে কোলে নিয়ে আঝোরে কেঁদে যাচ্ছে লক্ষীবালা!

"সে রাতে হাতে নাতে ধরা পড়া রাইগোপাল ও রসবালাকে টেন্ডারি দেওয়া হল। মাথা মুড়িয়ে জুতার মালা গলায় ঝুলিয়ে পিছনে পিছনে থালা-কাসা-টিন বাজিয়ে গোটা জেলেপাড়া ঘুরানো হল দু'জনকে। পাড়া ঘুরিয়ে তাদের যখন রাইগোপালের উঠানে আনা হল, তখন দরজায় খিল লাগিয়ে ছেলে কোলে নিয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে যাচ্ছে লক্ষীবালা"। লক্ষীবালার এই কান্নার তাৎপর্য অনেক স্বামীর কুকীর্তির অপমান, নিজেকে সকলের কাছে ছোট হয়ে যাবার অপমান, নারিত্বের প্রতি অসম্মানের অপমান এই সবই প্রকাশ পেয়েছে লক্ষিবালার চোখের জলে। এখানে লক্ষীবালা একজন জেলেনি পেয়েছে লক্ষীবালার চোখের জলে। এখানে লক্ষীবালা একজন জেলেনি শুধু নয় সমগ্র জেলেনীদের প্রতিনিধি। যে প্রতিশোধ স্পৃহা তার মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল দীর্ঘ অবমাননী ও অপমান থেকে তার জবাব সে দিতে পেরেছে 'বহদ্দার' গর্বী তার স্বামী রাইগোপালকে। গল্পটি ছোটগল্পের লক্ষনাক্রন্ত। গল্পটির মধ্যে কৈবর্ত্য দাম্পত্য জীবনের একটি বাস্তবদিক উদ্ভাসিত হয়েছে। ভাষা, সংলাপ, ঘটনাসবই বাস্তবসমৃদ্ধ ও নিরাসক্ত দৃষ্টিতে উজ্জ্বল। 'টেন্ডারি' প্রথা আজও চট্টগ্রামের কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত। অবৈধ্য প্রেমাসক্তকে মাথা মুড়িয়ে খোল ঢেলে জুতার মালা পড়িয়ে গ্রাম পরিক্রমা করাকেই গ্রামীণ একটি শব্দবন্ধে 'টেন্ডারি' বলে। এই গল্পে রাইগোপালের "টেন্ডারির' মাধ্যমে গল্পটি শেষ হয়েছে। অসহায় বিবধস্ত, বিপর্যস্ত লক্ষীবালার চোখের জলেই গল্পটি পরিশুদ্ধ। গল্পকার ভাষা প্রয়োগে একেবারেই Local colour ব্যবহার করেছেন। কোথায় ভাষাকে কৃত্রিম করে তোলেননি। সহজ সরল ভাবে এক অসাধারন পরিপুষ্ট ছোটগল্প রচনা করেছেন হরিশংকর জলদাস।

সেবাপরায়ন, পতিব্রতা, সংসারী সবদিক থেকেই লক্ষীবালা অনন্যসাধারন চরিত্র। তার প্রতিশোধ স্পৃহা প্রতিবাদী রমনীর যথার্থতা প্রমান দেয়।

'একজন জলদাসীর গল্প' একটি সার্থক ছোটগল্প এইগল্পটির দুটি দিক পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ জগৎহরির মতো একজন হতদরিদ্র কৈবর্ত মানুষের অগাধ দেশপ্রেমে ও অন্যায়ের প্রতি প্রতিবাদী কণ্ঠের প্রকাশ যেমন গল্পটির মূলসূত্র তেমনি দেশের কাজ করতে গিয়ে চিরতর হারিয়ে যাওয়া জগৎহরির নিরাপ্রিতা অসহায় সন্তান সম্ভবা স্ত্রী ও তার জলদাসীর নির্মম জীবনাতিপাত এই গল্পের কাঠামো তৈরী করেছে। একদিন রাতের অন্ধকারে নৌকা নিয়ে বের হয়। তারপর ফিরে আসার সব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তার স্ত্রীর কাছে ফিরে আসে না। হারিয়ে যায় অজানালোকে। জলদাসের স্ত্রী তার আসার পথ চেয়ে বয়ঃবৃদ্ধা হয়ে যায়, একদিনের সুন্দরী মেয়েটি হয়ে ওঠে পাগলি তারপর কালের নিয়মে মারা যায় সে। গল্পকার তার য়গোতোক্তির মাধ্যমে গল্পটি বিবৃত করেছেন। গল্পাকার একটি নিটোল ছোটগল্পের কাঠামো নির্মানে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়কার ঘটনা অবলম্বনে গল্পটি রবি*** পাকিস্থানী হানাদার বাহিনী মাঝে মধ্যেই প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে আশ্রানিত এবং গ্রামগুলির অধিবাসীদের অকথ্য অত্যাচার চালাত বাংলাদেশি কামান্ডার ও সাধারন মানুষ মিলিত ভাবে এদের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করত। পাকিস্থানের তৎকালীন সেনা প্রধান ইয়াইয়া খান এর সেনাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য কমান্ডার সেলিম খোন্দকার জলদাস জগৎহরির বাড়িতে আসে তার ডাক শুনে সে তার নৌকা নিয়ে তার সাথে রওনা দেয় কর্নফু নদীর তীরে। যাবার আগে তার স্ত্রী সরলাবালাকে বলে যায়। "বাধা না দিও। এ-ই যায়ইম আর আইস্যাম।" কিন্তু জগৎহরি ভালোই জানে যাওয়াটা নিশ্চিত হলেও ফেরাটা নিশ্চিত নয়। খান সৈন্যদের হাঙ্গামা থেকে ফিরে আসা প্রায় অসম্ভব। সরলাবালা কাতর মিনতি করলেও দেশপ্রেমে উজ্জ্বল চরিত্র জগৎহরির কাছে তা তুচ্ছ হয়ে যায়। আই জানি তুঁই কোনানে যাইতাছ। আঁই পোয়াতি। ঘরত্ কেউনাই। তোঁইয়ার কিছু হইলে আঁরে চাওইন্যা কেউ নাই। পথের ভিখারি হওন পড়িবো। আঁর লগে লগে তোঁইয়ার সন্তানও থালা লই অলিতে গলিতে ঘুরইবো।" স্ত্রী এই সত্য ও আর্ত মিনতি সত্বেও পাকিস্থানী খান সেনাদের বিরুদ্ধে দেশোমাতৃকাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায়। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে শুধু বিলে যায়।- "এইবাবের মতো যাইতে দেও। আমনে আর কোনদিনও যাইতাম নো। আঁই ত্বরাত্বরি ফিরি আইস্যম কথা দিলাম।" এই প্রতিশ্রুতিকে মিথ্যা প্রমান করে আর কোনদিনও ফিরে আসেনি সে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষহলে সবাই ফিরে এলেও সে আর আসেনি। সরলাবালা তার খোঁজে অক্লান্ত। দেখতে দেখতে চৌত্রিশ বছর কেটে গেলেও তার স্বামী আর আসেনি। অসহায় দারিদ্র যন্ত্রনার মধ্যেই পুত্র পপৌত্রকে নিয়ে বেঁচে থাকেছে সে। স্বামীর ফিরে আসার আকুলতা নিয়ে অপেক্ষার মধ্যেই সরলাবালার মৃত্যু হয়। শ্মশানে শেষকৃত্য করে আসার সময় কথোপকথনের মাঝেই গল্পটি শেষ হয়। অভাগী জলদাস সরলবালার চরিত্রটি এখানে পেয়েছে ভিন্নতর মর্যদা। অন্যজলদাসীদের মতো স্বামীর হারিয়ে যাবার পর 'সাঙ্গা' করেনি। কেবল অকৃপন শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা নিয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেছে। মৃত্যুতেও অপেক্ষার শেষ হয়নি। গল্পের শেষে তাই কথক কামনা করেছেন সরলাবালা ও তার স্বামীর পুর্নমিলন।- "আচ্ছা-যাই ভাই। বহুক্ষণ আপনাকে আটকে রাখলাম। যদি পারেন এই দুখিনি জেলেনিটির কথা মাঝে মধ্যে স্মরণ করেন। আর যদি স্রস্টার বিশ্বাস করেন তাকে আপনার প্রয়োজনের কথা বলা শেষ হলে, সরলাবালার কথা একটু বলবেন। কী বলবেন? বলবেন- অন্তত স্বর্গে হলেও সরলা জগৎহরির সাক্ষাত্ত পায়।" বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ আত্মবলিদান যারা করেছিল তাদের পাশাপাশি তাদের পরিবারের পরোক্ষ আত্মত্যাগ, তথা আত্মবলিদানও অনেক তাৎপর্যপুর্ন। বর্তমান প্রজন্ম তাদের সেই ত্যাগের ইতিহাস জানতে পারে না। এই গল্পে জেলেনি সরলাবালার আত্মত্যাগও দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল। গল্পটি করুন রসাত্মক ও হৃদয়বিদায়ক। প্রান্তবাসী কৈবর্ত্য সমাজের নারীদের যন্ত্রনা এখানে পেয়েছে বহুমাত্রিক তাৎপর্য। সমুদ্রের জলে বিপর্যয়ের মাঝে হারিয়ে যাওয়া হোক কিংবা মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে না ফিরে আসাই হোক প্রতিটি ক্ষেত্রে কৈবর্ত্য জলদাসীদের জীবনে থাকে "শুধূই অপেক্ষা' অন্যত্র গল্পকার এই বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন 'জলপুত্র' ও মোহনা' উপন্যাসে।

হরিশংকরের অন্যতম প্রধান গল্প 'চরনদাসী' একটি ভিন্নস্বাদের গল্প। এইগল্পে নাটকীয়তায় ভরপুর। স্বামী ভক্তি তথা কৃষ্ণভক্তির অন্তরালে লুকিয়ে থাকা এক কদর্য রূপকে গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন চরনদাসীর চরিত্রে। কৈশোরে সে প্রেমনিবেদন করেছিল গ্রামেরই জেলে হারাধন জলদাসকে এবং তার সঙ্গে শারীরিক মিলনেও প্রবৃত্ত হয়েছিল। তার পিতা মঙ্গলাচরন বহদার যখন জানতে পারে তার কন্যা সন্তান সম্ভাবা। "গত দুই মাস ধরি চরনদাসীর মাসিক নাকি বন্ধ।" তখন পরিবারের সামনে এক বৃহৎ বিপর্যয় এসে উপস্থিত হয়। তার জ্যেষ্ট পুত্র রামচরণের কথাতে শেষপর্যন্ত বৌরাগির বাবাকে নিয়ে পরামর্শ করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করা হয়। অবশেষে চরনদাসী বলে- তার এহেন ক্ষতি করেছে- "হারাধইন্যা! শেষ পর্যন্ত গ্রাম ও পরিবারের প্রবলচাপের মধ্যে হারাধন ও চরনদাসীর বিবাহ হয়ে যায়। এভাবে কিছুদিন দাম্পত্য জীবন কাটার পর চরনদাসীর একটা সুন্দর পুত্র সন্তান জন্মায়। তার বয়স এখন বারো। দীর্ঘদিন পর সন্তানলাভের ইচ্ছা জাগে হারাধন ও চরনদাসীর। চরনদাসীর পরামর্শে শহরের ডাক্তারের কাছে বীর্য পরীক্ষা করে জানা যায় হারাধন জন্ম থেকে সন্তানের পিতা হতে অক্ষম। 'আপনার স্বামী হারাধনের সন্তান উৎপাদনের কোনও ক্ষমতা নেই। কোনও কালে ছিলও না'। এটাই পরীক্ষিত সত্য। তাহলে যে সন্তানকে হারাধনের বলে তাকে বিবাহ করতে বাধ্য করিয়েছে এবং যে সন্তানকে হারাধন তার নিজের সন্তান বলে মনে করে প্রকৃত পক্ষে অন্যপুরুষের সন্তান। কিন্তু কার সন্তান? গল্পকার তার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছেন গল্পে- "সুখমোহনের গায়ের রঙ সাহেবদের মতন, চরণদাসী সুখমোহনকে ডাকে গোঁরাচাদ বলে।" ধনী বহদ্দার সাধনের শালা আঁজলার সঙ্গেও চরনদাসী কৈশোরপ্রেম এসেছিল। তাকে দেখতে ছিল-"গোরা সাহেবের মতোন।' এখানে স্পষ্ট বোঝা যায় সুখমোহন প্রকৃতপক্ষে চরনদাসী ও আঁজলার মিলনের সম্পদ। সে এটা জানতনা এমন নয় কিন্তু হারাধনের সাথে নিয়ে করতে চেয়েই এই মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে। দীর্ঘ বার বছর স্বামীগত ও কৃষ্ণগতাপ্রান চরনদাসী সেই সত্যকে লুকিয়ে রেখেছে। তাই হারাধনের সন্তান উৎপাদনের কোন ক্ষমতা নেই এটা জানার পর সে অসহায় বোধ করেছে কেননা এই কঠিন সত্য জানার পর হারাধন কোনপথ অবলম্বন করবে এই ভেবেই সে বিষন্নতা বোধ করেছে। এখানে স্ত্রীয়া চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি অত্যন্ত নিঃখুত ভাবে তুলে ধরেছেন গল্পকার গল্পটি একটি সার্থক ছোটগল্পের রূপ পরিগ্রহ করেছে ও সমাপ্তিতে 'শেষ হইয়া হইলনা শেষ' এর ব্যঞ্জনা দিয়েছে।'প্রতিশোধ গল্পটি হরিশংকরের একটি সামাজিক গল্প হলেও এর ভিত্তি মনস্তাত্ত্বিক। এই গল্পের মধ্যেও বেশ কয়েকটি মাত্রা দেখা যায়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবর রহমানকে হত্যা সহ তৎকালীন রাষ্ট্র নৈতিক অবস্থার আবহে একটি সচ্ছল পরিবারের অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়ার করুণ কাহিনীর পাশাপাশি স্বাধীনোত্তর বাংলাদেশের সমাজে নারীদের প্রতি শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কাহিনী এখানে একত্রিত হয়েছে। মাধুরীর মতো উচ্চশিক্ষিতা হবার স্বপ্ন দেখা ছিল মদ্যাসক্ত, জুয়ারি ও অত্যাচারী। এরই পাশাপাশি শ্বশুড়ি ছিল 'দজ্জাল'। শত অত্যাচারে অভুক্ত অধ্ররভূক্ত অবস্থায় থাকলেও মাধুরী কোন দিনও তার বেদনার্ত জীবনের কথা ঘৃনাক্ষরেও কাউকে জানতে দেয়নি। বাবার প্রতি এক তীব্র অভিমান থেকেই তার জীবনকে নিজে থেকে লুকিয়ে রাখতে চেয়েছে। স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে মাধুরী আজ একবস্ত্রা। তার চোখের কোনে কালি 'লিউকো মিয়ার আক্রান্ত'। মারাও যায় জীবনসংগ্রামে হেরে গিয়ে। তবু সে জোর করে পিতার বিবাহ দেবার বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেনি। তাই সে তার কোন আর্তি করার কান পর্যন্ত পৌছুতে দেয়নি। গল্পের শেষে তার পিতা মাধুরীকে উদ্দেশ্য করে অনুশোচনা করে বলেছে- 'আমায় ক্ষমা গরি দিও।' গল্পটির নামকরনটি অত্যন্ত সাংকেতিক ধর্মী। এখানে প্রতিশোধ নিয়েছে মাধুরী তার বাবার বিরুদ্ধে। তার পিতা তাকে জোর করে লেখাপড়া থেকে ছাড়িয়ে দিয়ে বিবাহ দিয়েছিল, পাত্রের সম্পর্কে যথাযথা কোনও খোঁজখবর না নিয়েই। এই অভিমান মাধুরীকে মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করে তোলে তাই সে পিতার প্রতি প্রতিশোধ নেয় নিজেকে শেষ করে। এক সে নিদারুন করুন আবহ গল্পটিকে বেদনায় ভারাক্রান্ত অরেছে। মাধুরীর মৃত্যু, তার পিতার অনুশোচনা পাঠকের কাছে আর্তি জাগায়। পাকিস্থানী হানাদার বাহিনীর করাল গ্রাম থেকে যে মাধুরীকে বাঁচানোর জন্য জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা হত তাকে না জেনে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে তার পিতা। তাই পিতার ও অনুশোচনা কম নয়। গল্পটি শেষ হয়েছে শোকে পাথর হয়ে যাওয়া পিতার আর্তি দিয়ে- "আমাকে মাফ করে দেরে

মা আমারে ক্ষমা করে দে।' বুকফাটা এই আর্তনাদের মধ্য দিয়েই গল্পটি যথাযথ ছোটগল্পের মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে।

'দুলারি এবং কয়েকজন' গল্পটি দুলারি নামক একটি বিবাহে প্রতারিত হওয়া মহিলার অসহায় রূপের আড়ালে যৌনবৃত্তি করা এবং তার সঙ্গে কয়েকজনের টানাপোড়েন গল্পের বিষয়বস্তু। দুলারি প্রকৃতপক্ষে কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের মেয়ে, কাজ করত চট্টগ্রামের একটি গারমেন্টস্ কোম্পানীতে। সেখানেই দুই সন্তানের পিতা বিবাহিত কায়স্থ শ্যামদত্তের সঙ্গে প্রেমে পড়ে এবং পরিনামে বিবাহ ও সন্তান হয়। যখন দুলারি জানতে পারে সে প্রতারিত হয়েছে সে বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে পড়ে। অধ্যাপকের ফ্ল্যাটের নীচে সে আশ্রয় নেয়। নানা লোক এসে তাকে ধর্ষণ করে। অধ্যাপক নিভোর চোখে সেটা দেখে। শহরের সন্তানদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জীবন সংশয় হতে পারে জেনে সে একটু প্রতিবাদ করেও পিছিয়ে আসে। যাদের একদিন দুলারির ধর্ষক বলে মনে করেছিলেন তারাই দুলারির আশ্রয়দাতার ভূমিকায় অবতীর্ন হন। এসব দেখে অধ্যাপক বাড়ি বদলানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং বাড়ি ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। যাবার সময় আপাত বিকৃতমস্তিক দুলারি তার ক্ষমতার বড়াই করে বলে- "অধ্যাপক গাড়িতে ওঠার সময় শুনলেন, দুলারি চিৎকার করে বলছে 'কারলগে লাগাতে আইছিলি হারামির পোলা? লাগতে আসার আগে চিন্তা করসনাই- মাগির পাওয়ার অনেক?" যাকে এতদিন আশ্রয়হীন মনে করে আশ্রয় দেবার দুর্মর যন্ত্রনায় অধ্যাপক চিন্তিত হয়েছে সেই দুলারি নিজেকে ক্ষমতাশালিভাবে। যাকে ধর্ষণ করেছে ভেবে অধ্যাপক ঘৃনায় লজ্জায় অনুশোচনা করত মনে মনে সে খরিদ্দার এর থেকে টাকা নিয়েই যৌনবৃত্তি করেছে। তাহলে আসল অসহায় কে? অধ্যাপক না দুলারি? এই প্রশ্নই জাগে গল্পটির পাঠ করলে। দুলারি নয় অধ্যাপকই অসহায় অবস্থায় গৃহত্যাগ করে। গল্পটির মধ্যে দুলারি চরিত্রটি করুনা ও ক্ষমতার মধ্যেও হাস্যরসের সৃষ্টি করে।

হরিশংকর জলদাসের 'মোহনা গল্পটি এমন একটি গল্প যেখানে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমস্ত দিক দিয়েই একট সার্থক ছোটগল্প। মোহনার বেশ্যা হয়ে যাওয়া এবং কৈবর্ত্য রাজা ভীমের সেনা চন্ডকের প্রথম মিলন ও পরবর্তীতে তাদের গভীর প্রেম এবং পালরাজার কাছে দেশকে পরাধীনকরে দেবার প্রধান 'বেইমান' ****** মস্তক ছেদন করে মোহনা। গল্পটি বিষয়বস্তু এটাই। ঐতিহাসিক পরিমন্ডলে লেখা হয়েছে এই গল্পটি। কৈবর্ত্য সমাজের অতীত ঐতিহ্য এই গল্পের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। হরিশংকর কৈবর্ত্য জীবন নিয়ে গবেষনা করেছিলেন একদা। সেই গবেষনার বাস্তবধর্মীতার সঙ্গে কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে এই গল্পটি রচনা করেছেন দেশপ্রেমিক ও স্বাজাতি প্রেমিক হরিশংকর জলদাস। 'চন্ডক ওগনে বুদ্ধিতে বিচক্ষনতায়, বাহুবলে একজন প্রকৃত রাজসেনানী। রাজা ভীম তাকে তার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য শ্রদ্ধা করতেন ও সর্বাগ্রে স্থান দিতেন। এহেন চন্ডক রাবাঙ্গনা গৃহে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। এখানেই কিশোরী মোহনার সতীত্ব কিনে নেয় সে। প্রথমবার মিলিত হ্যে মোহনার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। এখানেই রাম্পালের দূতু অনোমদর্শী এসে তাকে রামপালের সঙ্গে মিত্রতা করার প্রস্তাব দেয়। পরবর্তী কালে প্রধান সেনাপতির পুরষ্কার পাবার আসায় 'বরেন্দ্রীসূর্য ভীমের সেবক' তার সঙ্গে প্রতারনা করে রামপালের সাথে যোগদান করে। ভীমের পরাজয় ঘটে এবং কৈবর্ত্য রাজার শাসন ভোৎ যায়। বিজয়ীর গর্বে উদ্ধত চন্ডকের এই স্বজাতি দ্রোহিতা তথা দেশ দ্রোহিতাকে মেনে নিতে পারেনি মোহনা। তাই সে তাঁরর স্বামী বঁটির সাহায্যে চন্ডকের মস্তক ছেদন করে তার প্রতি প্রতিশোধ নিয়েছে। মোহনা জলদাসী জেলেনির মেয়ে। চন্ডক ও তাই অথচ চন্ডকের দেশদ্রোহিতা ও লালসা কৈবর্ত্য সমাজকে ধ্বংস করে দিতে পেরেছিল। তাই চন্ডকের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহন করে মোহনা তৃপত হয়েছে। গল্পটির মধ্যে বেশ্যাপল্লির সংস্কার ও লৌকিক আচার আচরনের সুন্দর ও বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। সুন্দরী কিশোরী মোহনার সঙ্গে লোহার বঁচির বিবাহ হয়েছিল বারাঙ্গনাদের সামাজিক নিয়ম মেনেই। "এই বৃত্তিতে ব্রতীহবার প্রথম দিনের কথা। সদ্য রজঃস্বলা হয়েছে সে। বামুন ঠাকুর এসে গোধূলি লগ্নে একটি বঁটির সঙ্গে বিয়ে দিল তার। সিঁথিতে চিকন করে সিঁদুর দিল। গলায় উঠলো গাঁদা ফুলের মালা"। অক্ষত ফেনি বারাঙ্গনা দের কুমারিত্ব বিক্রি হত। চন্ডক 'আধাপন কড়ি' দিয়ে মোহনার সতীত্ব ক্রয় করেছিল। গল্পকার এই গল্প ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সুন্দ্রর ও যথাসম্ভম বাস্তব করে উপস্থাপন করেছেন। গলটি ছোটগল্পের লক্ষনীক্রান্ত। মোহনার চরিত্রের

বিবর্তনটি সুন্দরভাবে বিচিত্র। তার প্রতি চন্ডকের শারীরিক অত্যাচার সে সহ্য করতে আরে কিন্তু দেশদ্রোহিতা বেইমানী, সে সহ্য করতে পারে না- মোহনার চরিত্রে এই মহান দিকটি দারুন ইঙ্গিতময়তার পরিস্ফুত হয়ে উঠেছে। যাকে সে প্রেম নিবেদন করেছে এবং ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেশেছে তাকেই নিজ হাতে খুন করে দেশপ্রেমের বিজয়বানী ঘোষনা করেছে সে। মোহনা চরিত্রটি একটি গতিশীল চরিত্র। গল্পটি হরিসংকর জলদাসের পরিনত মানসিকতার অপূর্ব নিদর্শন ও বাংলা ছোটগল্পের অক্ষয় সম্পদ।

হরিশংকর জলদাসের সাহিত্য রচনার মূল কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে- "হরিশংকর নিজে প্রান্তিক সমাজের মানুষ। তাই তার লেখায় দোম, মুচি মেথর জেলে ইত্যাদির কথাই বারবার ফিরে আসে। তিনি বলেন,- জেলে সমাজে জন্মেছি বলে এ-সমাজ আমার ভালোভাবে জানা। তাই জেলে সমাজকে জানতে হলে অবশ্যই হরিশংকরকে পাঠ করতে হবে। নদী-সমুদ্রে মানুষজন হরিশংকর জলদাসের পরম আগ্রহের বিষয়"।[২] তার 'জলদাসী গল্প' গ্রন্থের গল্পগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। বরং বঙ্গোবসাগরের তীরবর্তী পতেঙ্গার জলদাসীদের বাস্তবমুখ্য আলেখ্য তাঁর ছোটগল্প গুলি। আঞ্চলিকতার বনে বাঙানো এই গ্রন্থের দশটি গল্পই প্রতিনিধি স্থানীয় যে কোন গল্পের সাথে তুলনা করা যেতেই পারে হরিশংকর একজন কৃতবিদ্য সাহিত্যিক। তাই তাঁর সাহিত্য সর্বদা লক্ষ্যসচেতন ও গন্তব্যমুখী- জলদাসীর গল্প তার ব্যতিক্রম নয়। প্রান্তবাসী ব্রাত্যজনের অবিসংবাদী দলিল এই গল্পগুলি। কৈবর্ত্য জনজাতির চলমান ইতিহাস বিবেকবান দ্রষ্ট্রার কলমে পেয়েছে সত্যে সৃষ্টিরূপ। সেই কারনেঈ সমালোচক ঠিকই বলেছেন-"Harishankar kindles the optimism that shines in his protagonist and that has his readers shine as well"[৩]

ঋণস্বীকার :

১. প্রকাশক, জলদাসীর গল্প, হরিশংকর জলদাস, মাওলা ব্রাদার্স ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০১১ প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা।
২. 'পড়ুয়া', হরিশংকর জলদাস এর বই, ওয়েব পোর্টাল ঢাকা ২০১৭।
৩. Subrata Kumar Das, Harishankar Jaladas & His Literacy Work, The Daity star, June-2012, Dhaka, Bangladesh.